মহাপ্লাবন

আবদুর রউফ চৌধুরী

Life Magazine, 5th September 1960.

জেমস উশার ওলড (১৫৮১-১৬৫৬) ও জন লাইটফুট (১৬০২-১৬৭৫) গণনা করে বলেছেন যে, বাইবেলে বর্ণিত 'মহাপ্লাবন' খ্রিস্টপূর্ব ২৩৪৮ খ্রিস্টাব্দে (পৃথিবীতে প্রথম মানব জন্মানোর ১৬৫৬ বছর পর) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দুই পণ্ডিত ব্যক্তির সূক্ষ্ম দিনক্ষণের হিশেব বিশ্বের অধিকাংশ ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় সঠিক ও গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন। তারা আরও মনে করেন যে, ঈশ্বর পৃথিবীর জীব-প্রাণীকে ধ্বংস করতে মহাপ্লাবন এনেছিলেন, তবে তিনি তার দৃষ্টিতে স্বীয় অনুগ্রহের প্রিয় পাত্র-পাত্রীকে বাঁচানোর জন্য একটি 'গোফর কাঠের' ও 'বেণু-বাঁশ দিয়ে' জাহাজ তৈরি করে নিয়ে ছিলেন, যা ছিল তিনতলা বিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে তিনশ' হাত, বিস্তারে পঞ্চাশ হাত, উচ্চতায় ত্রিশ হাত। জাহাজটির বাইরে-ভিতরে আলকাতরার প্রলেপ ছিল। এই জাহাজে হযরত নোয়া[১] (আ.), তাঁর ছেলেরা, তাঁদের বধূরা প্রবেশ করেন, এবং স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে জোড়ায়-জোড়ায় যতসব শুচি ও অশুচি জীবজন্তু– মানুষ-পশু-পাখি-সরিসৃপ– তাদের সঙ্গে ছিল, আর ছিল তাদের জন্য খাদ্য হিশেবে সবরকম খাদ্যসামগ্রী। সময়মত পৃথিবীর উপর প্লাবনের জলরাশি দেখা দেয়। চল্লিশ-দিন, চল্লিশ-রাত ধরে চলতে থাকে অঝোরে মহাবৃষ্টি। জলে ভাসতে থাকে হযরত নোয়া (আ.)-র জাহাজটি। একসময় বিশাল পৃথিবীর সব পাহাড়-পর্বতের চূড়োগুলি জলে নিমজ্জিত হয়, আর জাহাজের বাইরের পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীসমূহ– মানুষ, পশু, সরিসৃপ, পাখি সবকিছু ডুবে মরতে থাকে। ১৫০ দিন ধরে জলরাশি পৃথিবীর উপরে উচ্চ হয়ে থাকে, ফলে জীবজগৎ ধ্বংস হয়ে যায়। একসময় মহাবৃষ্টি থেমে গেলে, জল কমতে থাকে, তারপর স্থলভূমির সন্ধান পাওয়া যায়; তখনই সবাই জাহাজ ছেড়ে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে।[২]

এখন দেখে নেওয়া যাক হযরত নোয়া (আ.) ও মহাপ্লাবন সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত তথ্যগুলি কী!

[১] টীকা: হিব্রু উচ্চারণে নোয়া (Noa) এবং আরবি উচ্চারণে নুহ্ (Nuh)।

[২] আদিপুস্তক : ৬:১৪-২২, ৭:১-২৪, ৮:১-১৯।

তৌরাৎ

'তৌরাৎ'-এ মহাপ্লাবন সম্পর্কে বলা হয়েছে: প্রভু বললেন, 'আমি যে মানুষ সৃষ্টি করেছি, তাকে পৃথিবীর বুক থেকে মানুষের সঙ্গে যত পশু, সরিসৃপ ও আকাশের পাখিদের উচ্ছেদ করব; কেননা আমি যে তাদের নির্মাণ করেছি, তার জন্য আমি দুঃখিত।'[৩] কারণ, পৃথিবীতে মনুষ্যজাতি সৃষ্টির পর মানুষ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব– 'ঈশ্বর-বন্দনা'– ছেড়ে দিয়ে ঘোর পাপকর্মে নিমজ্জিত হয়; লোভ-হিংসা-বিদ্বেষ আর অপরাধ-প্রবণতার ফলে ভুলে গিয়েছে তাদের সৃষ্টিকর্তাকে, তাদের ঈশ্বরকে। মনুষ্যজাতির এই অধঃপতন দেখে বিচলিত বোধ করলেন ঈশ্বর; ক্রুদ্ধ হলেন তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতের ওপর। তিনি মনে মনে সংকল্প করলেন, এই পাপ এবং পাপীদের কাছ থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করবেন, তাই ধ্বংস করে ফেলবেন তাঁর সৃষ্ট জগৎকে, তারপর তিনি নূতন করে ধরণীকে গড়ে তুলবেন আবার। ধ্বংসের মাধ্যম হিশেবে তিনি বেছে নিলেন এক মহাপ্লাবন; যে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাবে দুনিয়ার সমস্ত পাপী, মুছে যাবে সকল পাপ, এমনকী ধ্বংস করে দেবেন পৃথিবীর চিরচেনা-মায়াবী জীবজগৎটিও; তবে তিনি শুধু বাঁচিয়ে রাখবেন তাঁর দৃষ্টিতে অনুগ্রহের পাত্র নোয়া, তাঁর পরিবার এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের। কারণ, নোয়া হচ্ছেন একজন সৎলোক, তিনি ছিলেন লামেখের পুত্র। 'লামেখ একশ' বিরাশি বছর বয়সে একটি পুত্রসন্তানের পিতা হয়ে তাঁর নাম দিয়েছিলেন নোয়া, কেননা তিনি বললেন, 'প্রভু যে ভূমি অভিশপ্ত করেছেন, সেই ভূমির কারণে আমাদের যে শ্রম ও হাতের ক্লেশ হচ্ছে, সেই ব্যাপারে এ আমাদের সান্ত্বনা দেবে।' নোয়ার জন্মের পর লামেখ আরও পাঁচশ' পঁচানব্বই বছর বেঁচে ছিলেন, এবং তিনি আরও পুত্রকন্যাদের পিতা হন। লামেখের বয়স সাতশ' সাতাত্তর বছর হওয়ার পর তাঁর মৃত্যু হয়। আর নোয়া পাঁচশ' বছর বয়সে শেম, হাম ও যাফেতের পিতা হন।[৪] সে-সময়কার লোকদের মধ্যে নোয়া ছিলেন 'ধার্মিক ও ত্রুটিহীন', তিনি ঈশ্বরের 'সঙ্গে চলতেন'।[৫] কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিতে সে-সময়কার সারা পৃথিবীই পাপের দুর্গন্ধে এবং জোরজুলুমে ভরে ওঠে।[৬] পৃথিবী ছিল 'অধর্মে পরিপূর্ণ'।[৭] আর তখনই ঈশ্বর পৃথিবীর উপর দৃষ্টিপাত করে দেখলেন যে, তা দুর্গন্ধময় হয়ে গেছে, কারণ পৃথিবী জুড়ে সমস্ত প্রাণীর চলাফেরায়, স্বভাবে পচন ধরেছে।[৮] তখনই ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, 'আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি:/ সমস্ত প্রাণীর শেষকাল উপস্থিত,/ কেননা তাদের কারণে পৃথিবী অধর্মে পরিপূর্ণ;/ আমি পৃথিবী সমেত তাদের নষ্ট করতে যাচ্ছি।'[৯] তারপর ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পাত্রপাত্রীকে বাঁচানোর জন্য একটি 'গোফর কাঠের' ও 'বেণু-বাঁশ দিয়ে' জাহাজ তৈরি করার নির্দেশ দেন, যা হবে তিনতলা বিশিষ্ট, দৈর্ঘ্যে তিনশ'-হাত, বিস্তারে পঞ্চাশ-হাত, উচ্চতায় ত্রিশ-হাত। জাহাজটির ছাদ থেকে এক-হাত উপরে একটি ছাদ তৈরি করারও নির্দেশ দেন, অবশ্য মূল-দরজাটি থাকবে জাহাজের একপাশে। জাহাজটির বাইরে ও ভিতরে আলকাতরার প্রলেপ দেওয়ারও আদেশ দেওয়া হয়।[১০] তারপর ঈশ্বর বললেন, 'আর আমি, আকাশের নীচে যত জীবজন্তুর মধ্যে প্রাণবায়ু রয়েছে সেই সকলকে বিনষ্ট করার জন্য এখন পৃথিবীর উপরে জলপ্লাবন ডেকে আনছি, পৃথিবীর সবকিছুই প্রাণত্যাগ করবে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমি আমার সন্ধি স্থাপন করব, তুমি তোমার ছেলেদের, নিজ বধূ ও তোমার ছেলেদের বধূদের সঙ্গে সেই জাহাজে প্রবেশ করবে। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে একজোড়া করে যত জীবজন্তু, যত প্রাণী তাদের প্রাণরক্ষার জন্য সেই জাহাজে প্রবেশ করবে; সবজাতের পাখি ও সবজাতের পশু ও ভূমির সবজাতের সরিসৃপ জোড়ায় জোড়ায় প্রাণরক্ষার জন্য তোমার সঙ্গে যাবে। আর তুমি, তোমার নিজের জন্য ও তাদের জন্য খাদ্য হিশেবে সবরকম খাদ্যসামগ্রী জোগাড় ও মজুদ করে নিজের কাছে রাখবে।'[১১]

---

[৩] আদিপুস্তক : ৬:৫-৮।
[৪] আদিপুস্তক : ৫:২৮-৩২।
[৫] আদিপুস্তক : ৬:৯।
[৬] আদিপুস্তক : ৬:১১।
[৭] আদিপুস্তক : ৬:১১।
[৮] আদিপুস্তক : ৬:১২।
[৯] আদিপুস্তক : ৬:১৩।
[১০] আদিপুস্তক : ৬:১৪-১৬।
[১১] আদিপুস্তক : ৬:১৭-২১।

তারপর ঈশ্বর নোয়াকে আবার বললেন, 'তুমি ও তোমার পরিবারের সবাই জাহাজে প্রবেশ কর। আমি দেখতে পাচ্ছি, এই প্রজন্মের মানুষদের মধ্যে আমার সামনে তুমিই সৎ। তুমি শুচি পশুর প্রত্যেক জাতের মধ্য থেকে স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত-জোড়া করে তোমার সঙ্গে নেবে, আর অশুচি পশুর মধ্য থেকেও স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে সাত-জোড়া করে নেবে। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে প্রত্যেক জাতের সাত-জোড়া আকাশের পাখিও সঙ্গে নেবে, যেন সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের বংশ রক্ষা পায়; কেননা সাত-দিন পরে আমি পৃথিবীতে চল্লিশ-দিন, চল্লিশ-রাত ধরে বৃষ্টি নামিয়ে আনব; যত প্রাণীকে আমি নির্মাণ করেছি, তাদের সকলকেই পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করব।'[১২] ঈশ্বরের হুকুম মতই নোয়া সব কাজ করলেন।[১৩] নোয়া এই সবকিছুই করলেন ঈশ্বর তাঁকে যেমন আজ্ঞা দিয়েছিলেন সে অনুসারে।[১৪] 'জলপ্লাবনের সময়ে, যখন জলরাশি পৃথিবীকে ঢেকে দিল, তখন নোয়ার বয়স ছিল ছশ' বছর।'[১৫] প্লাবনের জলরাশি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নোয়া, তাঁর স্ত্রী, তাঁর ছেলেরা ও ছেলেদের স্ত্রীরা সেই জাহাজে প্রবেশ করলেন। শুচি-অশুচি পশু-পাখি ও মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ স্ত্রী-পুরুষ মিলে জোড়ায় জোড়ায় সেই জাহাজে প্রবেশ করল; ঈশ্বর যেভাবে নোয়াকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন, সে অনুসারেই। সাত-দিন পরে পৃথিবীর উপর প্লাবনের জলরাশি দেখা দিল। নোয়ার বয়স যখন ছশ'-বছর, দু-মাস, সাত-দিন তখন, ঠিক সেদিনেই, মহাতল গহ্বরের সমস্ত উৎসদ্বার ভেঙে গেল এবং আকাশের সমস্ত জলকপাট খুলে গেল, আর চল্লিশ-দিন ও চল্লিশ-রাত ধরে পৃথিবীর বুকে মহাবৃষ্টি নামতে শুরু করল।[১৬] চল্লিশ-দিন ধরেই পৃথিবীতে জলপ্লাবন চলল, জল বেড়েই চলল, জল বাড়তে বাড়তে মাটি ছেড়ে জাহাজটিকে শূন্যে ভাসিয়ে নিল। জলরাশি প্রবল হল, ভূমির উপরে জল দ্রুতবেগে বাড়তে লাগল, এবং জাহাজটি জলের উপর দিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগল। জলরাশি ভূমির উপরে উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল, যে-পর্যন্ত আকাশমণ্ডলের নীচের যত পাহাড়-পর্বত আছে সেগুলি জলরাশিতে নিমজ্জিত হল; ফলে যেখানে যত বড় পাহাড় ছিল সব ডুবে গেল। সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবিয়ে জল আরও পনেরো-হাত উপরে উঠে গেল; এর ফলে মাটির উপর ঘুরে বেড়ানো প্রাণী, পাখি, গৃহপালিত আর বন্যপশু, মাটির বুকে চরে বেড়ানো যত সরিসৃপ এবং সমস্ত মানুষ মারা গেল। শুকনো মাটির উপর যেসব প্রাণী বাস করত, অর্থাৎ শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ে যারা বেঁচে ছিল, তারা সবাই মরে গেল। ঈশ্বর এইভাবে ভূমির সমস্ত প্রাণী পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেললেন; তাতে মানুষ, পশু, সরিসৃপ এবং আকাশের পাখি সবই পৃথিবী থেকে উচ্ছিন্ন হল; কেবল নোয়া এবং তাঁর সঙ্গে যারা জাহাজে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তারা বেঁচে গেলেন। পৃথিবী একশ'-পঞ্চাশ-দিন জলে ডুবে রইল।[১৭] জাহাজে নোয়া এবং তাঁর সঙ্গে যেসব গৃহপালিতপশু ও বন্যপ্রাণী ছিল ঈশ্বর তাদের কথা ভুলে গেলেন না; তিনি পৃথিবীর উপরে বাতাস বইলেন, ফলে জল কমতে লাগল। এর আগেই অতল গহ্বরের সমস্ত উৎসদ্বার ও আকাশের সমস্ত জলকপাট বন্ধ করে দিলেন এবং আকাশ থেকে মহাবৃষ্টি ঝরা থেমে গেল। ক্রমে স্থলভূমির উপর থেকে জল সরে গেল। বন্যা শুরু হওয়ার একশ'-পঞ্চাশ-দিন পর দেখা গেল জল অনেক কমে গেছে। সপ্তম-মাসে, সপ্তদশ-দিনে জাহাজটি আরারাতের পাহাড়শ্রেণীর উপরে গিয়ে আটকা পড়ল। এরপরেও জল কমে যেতে লাগল, আর দশম-মাসের প্রথম-দিনে পাহাড়শ্রেণীর চূড়া দেখা দিল।[১৮] 'চল্লিশদিন কেটে যাওয়ার পর নোয়া জাহাজে নিজের তৈরি জানাল খুলে একটি দাঁড়কাক ছেড়ে দিলেন; আর পৃথিবীর উপরে জল শুকিয়ে না-যাওয়া পর্যন্ত দাঁড়কাকটি উড়ে উড়ে যাতায়াত করতে লাগল। স্থলের উপরে জল কমেছে কী না, তা পরীক্ষনিরীক্ষা করার জন্য তিনি একটি কপোত ছেড়ে দিলেন; কিন্তু সমস্ত পৃথিবী জলে আবৃত থাকায় কপোতটি পা রাখার মত স্থান পেল না, নোয়ার কাছে ফিরে এল; তিনি হাত বাড়িয়ে কপোতটিকে ধরে নিজের কাছে জাহাজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলেন। আরও সাত-দিন অপেক্ষা করার পর তিনি জাহাজ থেকে সেই কপোতটিকে আবার ছেড়ে দিলেন, কপোতাটি সন্ধ্যাবেলায় তাঁর কাছে ফিরে এল; আর দেখা গেল তার ঠোঁটে জলপাইগাছের একটি কচিপাতা রয়েছে, তখন নোয়া বুঝলেন, স্থলের উপর থেকে

[১২] আদিপুস্তক : ৭:১-৪।
[১৩] আদিপুস্তক : ৭:৫।
[১৪] আদিপুস্তক : ৬:২২।
[১৫] আদিপুস্তক : ৭:৬।
[১৬] আদিপুস্তক : ৭:৬-১২।
[১৭] আদিপুস্তক : ৭:১৭-২৪।
[১৮] আদিপুস্তক : ৮:১-৫।

জল সরে গেছে। আরও সাত-দিন অপেক্ষা করার পর তিনি কপোতটিকে আবারও ছেড়ে দিলেন; এবার সে আর ফিরে এল না।'[১৯] তখন নোয়ার বয়স ছশ'-এক বছর, সেই বছরের প্রশত-মাসের প্রথম-দিনে পৃথিবীর উপরে জল শুকোতে শুরু করল; নোয়া জাহাজের ছাদ খুলে তাকিয়ে দেখলেন যে, মাটির উপরটা শক্ত হতে শুরু করেছে। দ্বিতীয়-মাসের সপ্তবিংশ-দিনের মধ্যে মাটি একেবারে শুকিয়ে গেল।[২০] তখন ঈশ্বর নোয়াকে বললেন, 'তুমি তোমার স্ত্রীকে, তোমার ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে এস, আর সেইসঙ্গে সমস্ত পশু-পাখি এবং মাটির বুকে চরে যত সরিসৃপ সব জীবজন্তু সকলকেই বের করে নিয়ে এস। আমি চাই যেন পৃথিবীতে তাদের বংশ ফলবান হয় ও বংশবৃদ্ধির করে।'[২১] তখন নোয়া, তাঁর স্ত্রীকে, তাঁর ছেলেদের ও তাদের স্ত্রীদের নিয়ে জাহাজ থেকে বেরিয়ে এলেন। আর নিজ নিজ জাত অনুসারে প্রত্যেক পশু, সরিসৃপ ও পাখি– স্থলভূমির সমস্ত প্রাণী– জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে এল।[২২] তখন নোয়া ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে একটি যজ্ঞবেদি স্থাপন করলেন, এবং সবধরণের শুচি পশুর ও সবধরণের শুচি পাখির মধ্যে-থেকে কয়েকটি নিয়ে বেদির উপরে আহুতি দিলেন।[২৩] ঈশ্বর সেই সবকিছুর সৌরভের ঘ্রাণ গ্রহণ করলেন; তখন ঈশ্বর মনে মনে বললেন, 'আমি মানুষের কারণে পৃথিবীকে আর কখনও অভিশাপ দেব না, কারণ ছেলেবেলা থেকেই মানুষের মন অধর্মে প্রবণ; আমি এবার যেমন করলাম, সকল প্রাণীকে তেমন আঘাতে আর কখনও আঘাত করব না।/ পৃথিবী যতদিন থাকবে,/ ততদিন বীজ বোনা ও ফসল কাটা,/ শীত ও উত্তাপ,/ গ্রীষ্মকাল ও হেমন্তকাল,/ দিন ও রাত্রি,/ এই সবরে আর কখনও নিবৃত্তি হবে না।'[২৪]

কোরআন

'কোরআন'-এ হযরত নুহ্ (আ.) এবং মহাপ্লাবণ সম্পর্কে বলা হয়েছে: 'আমি নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের কাছে একথা বলে প্রেরণ করেছিলাম, তুমি তোমার সম্প্রদায়কে সর্তক কর, তাদের ওপর যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আসার আগে। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। এ-বিষয়ে যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর, তাঁকে ভয় কর ও আমার আনুগত্য কর। তিনি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং নির্দিষ্টসময় পর্যন্ত তোমাদের অবকাশ দেবেন; নিশ্চয় আল্লাহর নির্ধারিত-কাল যখন উপস্থিত হবে, তখন অবকাশ দেওয়া হবে না, যদি তোমরা তা জানতে! [...] তাদের পাপসমূহের জন্য তাদেরকে জলে নিমজ্জিত করা হয়েছে, অতঃপর ঢোকানো হয়েছে দোজখে। তারপর তারা আল্লাহ ছাড়া কারোকে সাহায্যকারী পায়নি।'[২৫] আল্লাহ নুহ্ (আ.)-কে আদেশ করেন তিনি যেন তাঁর সম্প্রদায়কে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস এনে বিগত পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করার আহ্বান জানান। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী নুহ্ (আ.) তাঁর সম্প্রদায়কে আহ্বান জানান। কিন্তু তারা তাঁর উপদেশ অমান্য করে এবং যথারীতি মিথ্যারোপে অটল থাকে। এর পরিণতিতে নুহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়কে [তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা ছাড়া] জলে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করা হয়। একই কথার সাক্ষ্য মিলে অন্যত্র: 'নিশ্চয়ই আমি নুহ্কে তার সম্প্রদায়ের প্রতি পাঠিয়েছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহ্র উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনও উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য একটি মহাদিবসের শাস্তির আশঙ্কা করছি। তার সম্প্রদায়ের প্রধানরা বলল, আমরা তোমাকে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার মাঝে দেখতে পাচ্ছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি কখনও ভ্রান্ত নই; কিন্তু আমি বিশ্বপ্রতিপালকের রসুল। আমার প্রতিপালকের বাণী আমি তোমাদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছি ও তোমাদেরকে সদুপদেশ দিচ্ছি। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় সম্বন্ধে জানি, যা তোমরা জান না। তোমরা কি অশ্চর্যবোধ করছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে বাচনিক উপদেশ এসেছে– যাতে সে তোমাদেরকে ভীতি-সতর্ক প্রদর্শন করে, যেন তোমরা সংযত-সাবধান

[১৯] আদিপুস্তক : ৮:৬-১২।
[২০] আদিপুস্তক : ৮:১৩-১৫।
[২১] আদিপুস্তক : ৮:১৬-১৭।
[২২] আদিপুস্তক : ৮:১৮-১৯।
[২৩] আদিপুস্তক : ৮:২০।
[২৪] আদিপুস্তক : ৮:২১-২২।
[২৫] আল-কুরআন : ৭১:১-৪, ২৫।

হোও এবং অনুগৃহীত হোও। তারপর তারা তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। আমি তাকে এবং নৌকাস্থিত মানুষগুলোকে উদ্ধার করলাম, আর যারা আমার নিদর্শনাবলী প্রত্যাখান করল তাদের ডুবিয়ে দিলাম। নিশ্চয় তারা ছিল অন্ধ।'[২৬] প্লাবনের শাস্তি প্রেরণ সম্বন্ধে হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম বলেছেন, 'যেসময় নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উপর প্লাবনের শাস্তি নেমে এসেছিল, তখন তারা জনসংখ্যা ও শক্তির দিক দিয়ে ভরপুর ছিল। সংখ্যাধিক্যের কারণে ইরাকের ভূখণ্ড এবং পাহাড়েও তাদের সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ তা'আলার চিরন্তন নীতি এই যে, তিনি অবাধ্য জাতিদেরকে ঢিল দেন। তারা যখন সংখ্যাধিক্য, শক্তি ও ধনাঢ্যতার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, তখনই তাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে।'[২৭] জলে নিমজ্জিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার সাক্ষ্য মিলে অন্যত্রও: 'নুহ্ বলেছিল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সাহায্য কর; কারণ তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলছে। তারপর আমি তার কাছে প্রত্যাদেশ প্রেরণ করলাম যে, তুমি আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে এবং তত্ত্বাবধানে নৌকা তৈরি কর। তারপর যখন আমার আদেশ আসে ও পৃথিবী প্লাবিত হয়, তখন নৌকায় উঠিয়ে নাও, প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া এবং তোমার পরিবার-পরিজনকে, তাদের মধ্যে যাদের বিপক্ষে পূর্বসিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে তাদের বাদ দিয়ে। এবং তুমি যারা সীমালঙ্ঘন করেছে তাদের সম্পর্কে আমাকে কিছু বলো না, নিশ্চয় তারা জলে নিমজ্জিত হবে। যখন তুমি ও তোমার সঙ্গীরা নৌকায় আরোহণ করবে, তখন বল, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায় থেকে উদ্ধার করেছেন। আরও বল, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কল্যাণকরভাবে নামিয়ে দাও, তুমি শ্রেষ্ঠ অবতারণকারী। এরমধ্যে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে এবং আমি পরীক্ষাকারী।'[২৮] অন্যত্র বলা হয়েছে: 'নুহের ওপর প্রত্যাদেশ হল যে, যারা ইতোমধ্যে বিশ্বাস করছে তারা ছাড়া তোমার সম্প্রদায়ের অন্য-কেউ কখনও বিশ্বাস করবে না। অতএব, তাদের কার্যকলাপে তুমি বিমর্ষ হবে না। তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে একটি নৌকা তৈরি কর, এবং যারা সীমালঙ্ঘন করছে তাদের ব্যাপারে তুমি আমাকে কোনও বলবে না। অবশ্যই তারা ডুবে মরবে। সে নৌকা তৈরি করতে লাগল, আর তার সম্প্রদায়ের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন তার পার্শ্ব দিয়ে যেত, তখন তারা তাকে বিদ্রূপ করত। সে বলল, তোমরা যদি আমাদের উপহাস কর, তোমরা যেমন উপহাস করছ আমরাও তদ্রূপ তোমাদের উপহাস করছি। আর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে, কার উপর চিরস্থায়ী অপমানকর শাস্তি অবতরণ করবে। অবশেষে আমার আদেশ এসে পৌঁছল এবং ভূপৃষ্ঠ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল, আমি বললাম, প্রত্যেক জীবের এক-এক জোড়া উঠিয়ে নাও, যাদের বিরুদ্ধে আগেই স্থির করা হয়েছে তারা ছাড়া তোমার পরিবার-পরিজনকে ও যারা বিশ্বাস করেছে তাদের নৌকায় তুলে নাও। বলাবাহুল্য, তার সঙ্গে অতি অল্প লোকজন বিশ্বাস করল। আর সে বলল, তোমরা এতে আরোহণ কর, আল্লাহর নামে এর গতি ও স্থিতি। আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাপরায়ণ, দয়াময়। আর নৌকাখানি তাদের বহন করে চলল পর্বতপ্রমাণ তরঙ্গমালার মাঝে, আর নুহ্ তার পুত্র যে আলাদা ছিল তাকে ডেকে বলল, প্রিয় বৎস! আমাদের সঙ্গে আরোহণ কর এবং অবিশ্বসীদের সঙ্গে থেকো না। সে (পুত্র) বলল, আমি অচিরেই এমন এক পাহাড়ে আশ্রয় নেব, যা আমাকে প্লাবন থেকে রক্ষা করবে। সে (নুহ্) বলল, আজ আল্লাহ্র হুকুম থেকে রক্ষা করার কেউ নেই। একমাত্র তিনি যাকে দয়া করবেন (সেই রক্ষা পাবে)। এমন সময় উভয়ের মাঝে তরঙ্গ আড়াল হয়ে দাঁড়াল, ফলে সে জলে নিমজ্জিত হল। আর নির্দেশ দেওয়া হল– হে পৃথিবী! তুমি তোমার জল শুষে নাও, আর হে আকাশ, ক্ষান্ত হও। এরপর বন্যা হ্রাস করা হল ও কাজ শেষ হয়ে গেল, আর জুদী-পর্বতে নৌকা ভিড়ল এবং ঘোষণা করা হল, ধ্বংসই সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়ের পরিণাম। আর নুহ্ তার পালনকর্তাকে সম্বোধন ক'রে বলল, হে আমার প্রতিপালক, আমার পুত্র তো আমার পরিবারের একজন আর তোমার প্রতিশ্রুতি নিঃসন্দেহে সত্য আর তুমি সর্বাপেক্ষা বিজ্ঞ বিচারক। আল্লাহ বললেন, হে নুহ্! নিশ্চয়, সে তোমার পরিবারের কেউ নয়। নিশ্চয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। সুতরাং আমার কাছে এমন অনুরোধ কর না, যার বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি যেন অজ্ঞদের দলভুক্ত না হও। নুহ্ বলল, হে আমার প্রতিপালক! আমার যে-বিষয়ে জ্ঞান নেই সে-বিষয়ে যাতে তোমাকে অনুরোধ না করি সেজন্য আমি তোমার

[২৬] আল-কুরআন : ৭:৫৯-৬৪।
[২৭] ইবনে কাসীর।
[২৮] আল-কুরআন : ২৩:২৬-৩০।

আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর, দয়া না কর, তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। হুকুম হল, হে নুহ্! তুমি আমার দেওয়া শান্তি আর তোমার নিজের ও তোমার সঙ্গে যেসব সম্প্রদায় আছে তাদের উপর কল্যাণ সহকারে অবতরণ কর। আর অন্যান্য যেসব সম্প্রদায় রয়েছে আমি তাদেরকেও উপকৃত হতে দেব; পরে আমার তরফ থেকে নিদারুণ শাস্তি তাদেরকে স্পর্শ করবে।'[২৯]

এ-থেকে জানা যায় যে, নুহ্ (আ.) তাঁর পরিজনবর্গ, অনুসারীবৃন্দ আর প্রয়োজনীয় রসদপত্র ও উপকরণাদিসহ (প্লাবনের দিনগুলি নিরাপদে অতিবাহিত করার জন্য) নৌকায় আরোহণের কথা; আল্লাহর প্রত্যাদেশ অনুসারে এবং তত্ত্বাবধানে নুহ্ (আ.)-র নৌকা তৈরি করার কথা। 'নৌকা তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল প্রত্যাদেশের মাধ্যমে হযরত জিব্রাঈল (আ.) হযরত নুহ্ (আ.)-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি শাল কাঠ দ্বারা উক্ত নৌকা তৈরি করেছিলেন।'[৩০] নুহ্ (আ.)-কে নৌকা নির্মাণপদ্ধতি ও কলাকৌশল শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ জানিয়ে দেন যে, তাঁর সম্প্রদায়ের উপর এক মহাপ্লাবন আসবে, তারা সবাই ডুবে মরবে, তখন তিনি যেন স্নেহপরবশ হয়ে তাদের জন্য আল্লাহের কাছে কোনও সুপারিশ না করেন। তারপর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, নৌকা তৈরিকালীন সময়ে নুহ্ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের উদাসীনতা, অবজ্ঞা ও দুঃসাহস এবং এর শোচনীয় পরিণতির বিষয়ে। তারপর প্লাবন আরম্ভকালীন করণীয় ও আনুষঙ্গিক ঘটনার বর্ণনা করা হয়েছে; যেমন কীভাবে ভূপৃষ্ঠ 'তান্নর'[৩১] ফেটে জল উথলে ওঠে; জোড়বিশিষ্ট প্রত্যেক প্রাণী এক-এক জোড়া করে নৌকায় তোলা। কোনও কোনও ইসলামিক বুদ্ধিজীবী মনে করেন যে, যেসব প্রাণী স্ত্রী-পুরুষের মিলনে জন্ম হয় এবং পানির মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে না, শুধু সেসব পশু-পাখিই নৌকায় উঠোনো হয়েছিল। নৌকায় আরোহণকারীদের সঠিক সংখ্যা কোরআন ও হাদিশে নির্দিষ্ট করে কোথাও উল্লেখ করা হয়নি; তবে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, তাদের সর্বমোট সংখ্যা ছিল আশিজন, যাদের মধ্যে হযরত নুহ্ (আ.)-এর তিন পুত্র হাম, সাম, ইয়াফেস এবং তাদের তিন স্ত্রীও ছিলেন। নুহ্ (আ.)-এর চতুর্থ পুত্র কেন'আন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে থাকায় সে ডুবে মরেছিল। এর উল্লেখ অবশ্য কুরআনে আছে; যখন দূর থেকে পিতা ও পুত্রের কথোপকথন চলছিল তখন এক উত্তাল তরঙ্গ এসে উভয়ের মাঝে অন্তরালের সৃষ্টি করল এবং কেন'আনকে নিমজ্জিত করল। ইসালামিক সূত্রে আরও জানা যায় যে, নুহ্ (আ.)-এর মহাপ্লাবনের সময় এক-একটি ঢেউ বড়-বড় পাহাড়ের চূড়া থেকে ১৫-গজ এবং কোনও কোনও বর্ণনায় পাওয়া যায় ৪০-গজ উচ্চতা বিশিষ্ট ছিল। তারপর বলা হয়েছে যে, ভূমি ও আকাশ আল্লাহর আদেশ পালন করল, মহাপ্লাবন সমাপ্ত হল, জুদী-পর্বতে নৌকা ভিড়ল। জুদী-পর্বত (একটি পর্বতমালার অংশবিশেষের নাম) হচ্ছে নুহ্ (আ.)-এর মূল আবাসভূমি, ইরাকের মোসেল শহরের উত্তরে ইবনে ওমর দ্বীপের অদূরে আর্মেনিয়া সীমান্তে অবস্থিত। তৌরাতে দেখা যায় যে, নুহ (আ.)-এর নৌকা আরারাত-পর্বতে ভিড়েছিল, তবে উভয় বর্ণনার মধ্যে মৌলিক কোনও বিরোধ নেই, কারণ একই পর্বতমালার অপর এক অংশের নাম হচ্ছে আরারাত-পর্বত। এখনও ইরাকের বিভিন্ন স্থানে সেই নৌকার ভগ্নাংশ অনেকের কাছে সংরক্ষিত আছে।

'কোরআন'-এ হযরত নুহ্ (আ.) এবং মহাপ্লাবনের কথা বলা হয়েছে, এবং সময়-সময় মহাপ্লাবনের কাহিনীটির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়েছে, যেমন– '[...] নুহের সম্প্রদায় যখন রসুলদের প্রতি মিথ্যারোপ করল, তখন আমি তাদের জলে নিমজ্জিত করলাম এবং তাদেরকে মানবমণ্ডলীর জন্য নিদর্শন করে দিলাম। সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।'[৩২] '[...] আমার দাস নুহের প্রতি তার সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল আর বলেছিল, এ তো উন্মাদ! অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল, আমি অসহায়-অক্ষম, অতএব, তুমিই এর প্রতিবিধান কর। তখন আমি আকাশের দরজা খুলে দিলাম প্রবল বৃষ্টিবর্ষণের জন্য, এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। তারপর পরিকল্পনা অনুযায়ী আকাশ ও পৃথিবীর পানি

---

[২৯] আল-কুরআন : ১১: ৩৬-৪৮।

[৩০] আল-হাদিশ।

[৩১] টীকা: তান্নর অর্থ ভূপৃষ্ঠ। ইমাম শা'বী বলেছেন যে, কুফার বর্তমান মসজিদের প্রবেশ দ্বারে মহাপ্লাবন শুরু হয়েছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন যে, নুহ্র (আ.)-এর ঘরের উনুন ফেটে পানি ওঠার কথা।

[৩২] আল-কুরআন : ২৫: ৩৭।

একাকার হয়ে গেল। তখন আমি নুহ্‌কে আরোহণ করালাম কাঠ ও পেরেক নির্মিত এক জলযানে। যা আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে চলত। আমি একে (জলযানটিকে) এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি।'[৩৩] '[...]আমি তাকে (নুহ্‌কে) ও তার সঙ্গে যারা ছিল তাদের বোঝাই করা নৌকায় রক্ষা করলাম। তারপর অবশিষ্ট সবাইকে জলে নিমজ্জিত করলাম।'[৩৪] 'আমি তো নুহ্‌কে তার সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণ করেছিলাম। সে তাদের মধ্যে বাস করেছিল সাড়ে ন'শো বছর। তারপর তাদেরকে মহাপ্লাবন গ্রাস করেছিল; কারণ তারা ছিল সীমালঙ্ঘনকারী। তারপর আমি তাকে ও নৌকারোগীদেরকে রক্ষা করলাম এবং নৌকাকে নিদর্শন করলাম বিশ্বজগতের জন্য।'[৩৫]

'কোরআন'-এ অবশ্য 'তৌরাৎ'-এর মত এত বিস্তৃত পরিসরে হযরত নুহ্‌ (আ.)-এর জাহাজের বর্ণনা কিংবা মহাপ্লাবনের ব্যাপারে (যেমন– জাহাজের উচ্চতা-আয়তন-ধারণ সংখ্যা, প্লাবন কতদিন ছিল ইত্যাদি) বক্তব্য দেওয়া হয়নি; শুধু 'কোরআন'ই নয়, 'তৌরাৎ' ব্যতীত অন্যকোনও ধর্মগ্রন্থে বা পৌরাণিক উপাখ্যানে এ-বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। এখন দেখা যাক অন্য ধর্মগ্রন্থে বা পৌরাণিক উপাখ্যানে এ-বিষয়ে কী বলা হয়েছে।

মৎসপুরাণ

প্রথম মানব 'মনু' একবার এক জলাশয়ে হাত-পা ধোতে গিয়ে ক্ষুদ্র একটি মাছ দেখতে পেলেন। ক্ষুদ্র মাছটি জলাশয়ের অন্যান্য রাক্ষুসে মাছ থেকে রক্ষা করার জন্য মনুর কাছে অনুরোধ জানাল। মনু তখন সেই মাছটিকে জলাশয় থেকে তুলে নিয়ে এসে 'নিরাপদ স্থান' হিশেবে জলভর্তি পাত্রে রেখে দিলেন। কয়েক দিনের মাথায় মাছটি আকারে বড় হয়ে গেলে যে-পাত্রে রাখা হয়েছিল সে-পাত্রে আর রাখা যাচ্ছে না দেখে মনু মাছটিকে একটি নিরাপদ জলাশয়ে নিয়ে গেলেন। কিন্তু কিছু দিনের মাথায় মাছটি আরও বৃহৎ হয়ে গেল, জলাশয়ে আর স্থান সংকুলান না হওয়ায় মনু বাধ্য হয়ে মাছটিকে নিয়ে গেলেন পুকুরে, সেখান থেকে নদীতে, এরপরও মাছটি দিনদিন দীর্ঘ হতে লাগল, শেষপর্যন্ত স্থান সংকুলানের জন্য বাধ্য হয়ে নিয়ে যেতে হল সমুদ্রে। একদিন মনু সমুদ্রে গেলে মাছটি, নিজেকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার বলে পরিচয় দিয়ে, পাপ আর পঙ্কিলতায় ডুবে যাওয়া সমগ্র পৃথিবীতে মহাপ্লাবন ব্যাপারে আগাম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে দ্রুত একটি বৃহৎ নৌকা বানাতে নির্দেশ দিল, কারণ আসন্ন মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যাবে। মনু ফিরে এসে মাছটির কথামত কাজ শুরু করে দিলেন। পরবর্তীতে ভগবান বিষ্ণুর ঘোষিত মহাপ্লাবন শুরু হয়ে গেলে সারা পৃথিবী তীব্র জলোচ্ছ্বাসে ডুবে যেতে লাগল; মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা মাছের নির্দেশ মত নৌকায় গিয়ে উঠলেন, আর মৎসরূপী বিষ্ণু তখন নৌকাটির গুণ টেনে নিয়ে বিরাট পাহাড়ের উপর রেখে দিলেন। মহাপ্লাবনে সমস্ত পৃথিবী লণ্ডভণ্ড হয়ে যাওয়ার পর, ভগবান বিষ্ণুর ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার পর, আস্তে আস্তে প্লাবনের জল কমতে লাগল। বন্যার জল কমে গেলে পৃথিবী পুনঃনির্মাণের জন্য মনু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পাহাড় থেকে ভূমিতে নেমে এলেন, এবং তাঁরা পুনরায় পৃথিবীতে বংশবিস্তারের মাধ্যমে মানবপ্রজাতি টিকিয়ে রাখার কাজে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।[৩৬]

রোমান কাহিনী

দেবতা-শিরোমণি জুপিটার একসময় প্রচণ্ড ক্রোধান্বিত হলেন মানুষের অপকর্ম ও পাপকর্ম দেখে; সিদ্ধান্ত নিলেন ধ্বংস করে দিবেন তাঁরই সৃষ্টি এই জীবজগৎকে। প্রথমে ঠিক করলেন আগুনে পুড়িয়ে ধ্বংস করবেন, কিন্তু পরে সিদ্ধান্ত বদলিয়ে নিলেন; মহাপ্লাবনের জলে ভাসিয়ে-ডুবিয়ে হত্যা করা হবে তাঁর সৃষ্টিকে। এজন্য দেবতা নেপচুনের সাহায্য নিলেন পৃথিবীতে ভয়ানক ভূমিকম্প ও বজ্রপাতের মাধ্যমে মহাপ্লাবনের জোয়ার সৃষ্টি করতে;

---

[৩৩] আল-কুরআন : ৫৪ : ৯-১৫।

[৩৪] আল-কুরআন : ২৬ : ১১৯-১২০।

[৩৫] আল-কুরআন : ২৯ : ১৪-১৬।

[৩৬] মৎসপুরাণ।

দেবতা-শিরোমণির নির্দেশ দেবতা নেপচুনের কাছে শিরোধার্য। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে শুরু হল ভয়ানক মহাপ্লাবন, বিশাল-বিশাল স্রোতের টানে ভেসে যেতে লাগল সকল প্রাণ, ডুবে যেতে লাগল পৃথিবী, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত ডুবল না শুধু পানাস্সুস পাহাড়ের চূড়া। ভয়ঙ্কর এই প্লাবনের সময় নৌকা বানিয়ে স্রোতে ভেসে-ভেসে পর্বতের চূড়ায় আশ্রয় নিলেন প্রমিথিউয়াসের পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং তার স্ত্রী পাইহা। আগে থেকেই তাদের সততা, নিষ্ঠায় মুগ্ধ ঈশ্বর জুপিটার। ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ হলে, তার আদেশে দুনিয়া থেকে বন্যার জল কমে গেল। ঈশ্বরের আশীর্বাদপ্রাপ্ত ডিউকেলিয়ন ও পাইহা একদিন পাহাড়ের চূড়া থেকে মাটিতে নেমে এলেন এবং দৈববাণী অনুসারে পৃথিবীতে পুনরায় বংশবিস্তার শুরু করলেন।[৩৭]

গ্রীক কাহিনী

রোমান কাহিনীটির সঙ্গে গ্রীসের পৌরাণিক কাহিনীর লক্ষণীয় মিল রয়েছে, যেমন প্রমিথিউয়াসের পুত্র ডিউকেলিয়ন এবং পাইহা নামের চরিত্র গ্রীক কাহিনীতেও রয়েছে, আর রোমান ঈশ্বর জুপিটারের বদলে সেখানে স্থান পেয়েছে জিউস ইত্যাদি।

জিউস একটি মহাপ্লাবন পাঠালেন তাম্রযুগের সকল মানুষকে ধ্বংস করার জন্য। প্রমিথিউয়াস তাঁর পুত্র ডিউকেলিয়নকে নির্দেশ দিলেন একটি সিন্দুক তৈরি করার জন্য। সকলই ধ্বংস হয়ে গেল, শুধু বেঁচে গেল পর্বতের উচ্চু চূড়ায় যারা আশ্রয় নিয়েছিল তারা। থ্যাসালী-পর্বত দ্বিখণ্ডিত হল। ইথমস ও পেলপোনেস ছাড়া সমস্ত পৃথিবী জলে ডুবে গেল। ডিউকেলিয়ন ও তাঁর স্ত্রী পাইহা ন'দিন ও ন'রাত সিন্দুকে ভাসতে-ভাসতে পার্নাস্সুস পাহাড়ের চূড়া আশ্রয় নিলেন। যখন মহাবর্ষণ থামল তখন জিউসের উদ্দেশ্যে তারা যজ্ঞার্ঘ্য দিলেন। জিউসের নির্দেশে, ডিউকেলিয়ন ও তার স্ত্রী পাইহা পাথর ছুঁড়তে লাগলেন, ডিউকেলিয়নের পাথর থেকে পুরুষ ও পাইহার পাথর থেকে নারী সৃষ্টি হতে লাগল।[৩৮]

সুমেরিয়ানের কাহিনী

ঈশ্বর একসময় তাঁর সৃষ্টির প্রতি প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে মনুষ্যপ্রজাতিকে ধ্বংস করে দিতে মনস্থির করলেন; কিন্তু সৎ ও নিষ্ঠাবান রাজা জিউসুদ্রের প্রতি প্রীত হয়ে দেবতা এ্যানলিল আগত বন্যার ব্যাপারে রাজাকে আগেই সতর্ক করে দিলেন এবং পরামর্শ দিলেন একটি বিশাল জাহাজ বানানোর জন্য। রাজা জিউসুদ্র দেবতা এ্যানলিলের পরামর্শ মত কাজ শুরু করে দিলেন। একসময় এল সেই ভয়ানক কালরাত্রি; চারিদিক থেকে শোঁ-শোঁ করে প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসা বাতাস আর সাতদিন-সাতরাত ধরে অবিরাম বৃষ্টিতে ধরণী ডুবে গেল। বন্যার সময় রাজা জিউসুদ্র ও তার পরিবারের সদস্যরা সদ্য তৈরি করা জাহাজে উঠে ভেসে বেড়াতে লাগলেন, একস্থান থেকে অন্যস্থানে। জাহাজে বসে রাজা জিউসুদ্র সূর্যদেবতা উতুর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন সূর্য উদয়ের জন্য, যাতে করে বৃষ্টি কমে গিয়ে বন্যার জল নামতে শুরু করে। আস্তেধীরে দেবতাদের ক্রোধ কমে এলে, ধরণী থেকে বন্যার জল কমতে লাগল, আকাশেও সূর্য দেখা দিল। বন্যার জল একেবারে কমে গেলে রাজা সবাইকে নিয়ে ভূমিতে নেমে এলেন, এবং দেবতাদ্বয় অনু ও এ্যানলিলের সন্তুষ্টি কামনায় একটি ভেড়া ও ষাঁড় কোরবানি দিলেন।

মহাপ্লাবনের পরে কোরবানি দেওয়ার ঘটনাটি তৌরাতেও উল্লেখ আছে।

[37] Ovid. The Metamorphoses, Horace Gregory (transl.), Viking Press, New York, 1958.
[38] Apollodorus, Sir James G. Frazer (transl.), Harvard University Press, Cambridge, 1921, 1976.

চীনের কাহিনী

স্বর্গের পিতা সিজুসিহ্ একজন মৃতমানুষের রক্ত ও কিছু মাংস নিয়ে আসার জন্য পৃথিবীতে একবার দূত প্রেরণ করলেন। দূতটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মানুষের কাছে গিয়ে ব্যর্থ হল, কিন্তু একজন ব্যক্তি 'দুমু' শুধুমাত্র স্বর্গের পিতার কথা রক্ষা করলেন। পিতা পৃথিবীবাসীদের এই বেঈমানি দেখে খুবই দুঃখিত হলেন, সঙ্গে-সঙ্গে বাগান্বিতও হলেন। পৃথিবীবাসীকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়ার জন্য আকাশ থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করতে লাগলেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারদিকে মারাত্মক প্লাবনের সৃষ্টি হল। মানুষ, প্রাণী সকলেই বন্যার জলে ভেসে যেতে লাগল, ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। কিন্তু দুমু, তাঁর চার ছেলে, কয়েকটি বুনো হাঁস ও ভোঁদরসহ একটি বড়সড়-লম্বা গাছে আশ্রয় নিল এবং স্বর্গের পিতার করুণায় বেঁচে গেলেন। আজকে যারা সভ্য বা লেখাপড়া জানে, তারা দুমুর ঐ চার সন্তানের বংশধর; আর যারা অশিক্ষিত বা সভ্যতার আলো পায়নি, তারা কাঠ দ্বারা নির্মিত মূর্তির বংশধর, যেগুলিকে দুমু ও তাঁর সন্তানেরা ভয়াবহ মহাপ্লাবরের পর কুড়িয়ে পেয়ে মেরামত করেছিল।[৩৯]

আফ্রিকার কাহিনী

অনেককাল আগে মাসাইদের ওখানে টামবাইনোত নামে একজন সৎ-আদর্শবান ও ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠাবান ব্যক্তি বাস করতেন। তার স্ত্রীর নাম নাইপান্দে এবং তাদের তিন সন্তানের নাম ওশমো, বার্তিমোরা ও বারমাও। একদিন টামবাইনোতের ভাই লেঙ্গারনি মারা গেলে স্থানীয় প্রথানুসারে তিনি মৃত ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করলেন। মৃত ভাইয়ের ঘরেও তিন সন্তান ছিল, ফলে ভাইয়ের বিধবা স্ত্রীকে বিবাহের পর সেসব সন্তানও টামবাইনোতের সন্তান হয়ে যায়; অর্থাৎ নিজের তিন সন্তানসহ মোট ছয় সন্তানের পিতা হন টামবাইনোত। পৃথিবীতে সেসময় প্রচুর জনসংখ্যা ছিল; জনসংখ্যার ভারে পৃথিবী কম্পমান। কিন্তু জনসংখ্যা অধিক থাকলেও মানুষের মধ্যে ন্যায়-নিষ্ঠা-নীতি-ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি বলতে কিচ্ছু ছিল না। হত্যা-ধ্বংস-দুর্নীতি-লুণ্ঠন-রাহাজানি ইত্যাদি অপরাধ-প্রবণতায় পৃথিবী ছেয়ে গিয়েছিল। ঈশ্বর মানুষের সেই অধোগতি দেখে ব্যথিত হলেন, ক্ষুব্ধ হলেন; মনঃস্থির করলেন ধ্বংস করে ফেলবেন এই মনুষ্যপ্রজাতিকে, সঙ্গে বাকি জীবজগতকেও, সবকিছু নূতন করে গড়ে তুলবেন আবার। কিন্তু ঈশ্বর টামবাইনোতের সততায় সন্তুষ্ট ছিলেন, তাকে নির্দেশ দিলেন কাঠ দিয়ে একটি জাহাজ তৈরি করতে, যেখানে আশ্রয় নেবেন টামবাইনোত, তার দুই স্ত্রী, ছয় সন্তান, ছয় সন্তানের স্ত্রী, এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রজাতির প্রাণী। টামবাইনোতের জাহাজ বানানো শেষ হলে, ঈশ্বর ভয়ঙ্কর বৃষ্টি শুরু করলেন। একটানা প্রচণ্ড বৃষ্টিতে চারদিকে ভয়ানক বন্যা দেখা দিল; বন্যায় ডুবে যেতে লাগল মানুষ, পশু-পাখি ইত্যাদি আর টামবাইনোত তার পরিবার নিয়ে ভেসে বেড়াতে লাগলেন একস্থান থেকে অন্যস্থানে। একসময় বৃষ্টি থেমে গেল, আর টামবাইনোত তার সঙ্গে থাকা একটি পায়রা উড়িয়ে দিলেন। বেশকিছুক্ষণ পর পায়রাটি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল; টামবাইনোত বুঝতে পারলেন : পায়রাটি চারিদিকে কোথাও বসবার জন্য শুকনো স্থান না পেয়ে জাহাজে ফিরে আসে। দিন কয়েক কেটে গেলে টামবাইনোত একটি শকুন উড়িয়ে দিলেন, তবে কৌশলে শকুনের পালকের সঙ্গে একটি তীর আটকে দিলেন; যাতে শকুনটি কোথাও বসলে, তীরটি যেন সেখানে আটকে যায়। সেদিন সন্ধ্যার দিকে শকুনটি ফিরে এলেও পালকের সঙ্গে আর তীরটি ছিল না। টামবাইনোত বুঝতে পারলেন শকুনটি কোনও নরম স্থানে বসেছিল, যেখানে তীরটি আটকে গেছে। কিছুদিন পর বন্যার জল কমে মাটির সমান হয়ে গেল। জাহাজটি এক জায়গায় এসে আটকে গেল। তখন টামবাইনোত ও তার পরিবারের সদস্যরা ভূমিতে নেমে এসে আকাশে অপূর্ব সুন্দর রঙধনু দেখতে পেলেন, তারা এই রঙধনুকে ঈশ্বরের ক্রোধপ্রশমিত হওয়ার লক্ষণ হিশেবে বিবেচনা করল।[৪০]

---

[৩৯] টীকা: চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ললোবাসীদের লোকগাঁথা। Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.

[৪০] টীকা: পূর্ব-আফ্রিকার মাসাইদের আঞ্চলিক লোকগাঁথা।

বৃহৎ বাংলাঞ্চলের কাহিনী (আসামসহ)

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলা: প্রথম মানবজাতি তার সৃষ্টিকর্তা সিং-বোঙ্গার (বোঙ্গা অর্থ অনৈসর্গিক আত্মা) প্রতি অজাচারী ও অসাবধানী হওয়ায় তিনি তাদের ধ্বংস করার জন্য মহাপ্লাবন সৃষ্টি করেন। মহাপ্লাবনের পর শুধু ষোলজন মানুষ রক্ষা পায়।[৪১]

উত্তর বাংলা: কয়েকজন মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পায়, কারণ তারা ছিল দার্জিলিংয়ের ত্যাঙঢঙ পাহাড়ের চূড়ায়।[৪২]

তিব্বত: ঈশ্বর গয়া বাংলার উপর দিয়ে মহাপ্লাবন শুরু করে তিব্বতকে জলমগ্ন করেন। তারপর তিনি মানুষজাতিকে সভ্য করে তুলেন।[৪৩]

উত্তর-পূর্ব বাংলা: মানবজাতি যখন তার ঈশ্বরের প্রতি মহার্ঘ্য দিতে ভুলে যায় তখন তিনি তাদের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত করে ছিলেন; তখন শুধু দুজন পুরুষ[৪৪] ও তাদের স্ত্রী রক্ষা পায়, তারাই মানবজাতির আদি পুরুষ।[৪৫]

লুসাই: একবার জলের রাজা, তিনি আবার শয়তান-দেবতাও। তিনি 'নগাইতি'-নামক এক অপূর্ব সুন্দরী নারীর প্রেমে পড়ে যান। শয়তান-দেবতা ও জলের রাজা তাঁর চিত্তহরণকারী নারীর কাছে প্রেমে নিবেদন করতে গেলে, নগাইতি তা প্রত্যাখান করে পালিয়ে যান। সাধারণ একজন নারীর এরকম দুঃসাহস দেখে শয়তান-দেবতা ও জলের রাজা খুবই অপমান বোধ করলেন, তিনি ক্ষুব্ধ হলেন, রাগান্বিতও। মানবীর সঙ্গে প্রেমে প্রত্যাখাত হওয়ার ফলে তিনি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন; প্রচণ্ড ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে তিনি মহাপ্লাবনের মাধ্যমে মানবজাতিকে আক্রমণ করলেন, তাদের 'ফান-লু-বুক' পাহাড়ে আবদ্ধ করলেন, এবং হুমকি দিলেন– নগাইতিকে না পেলে সকলকে জলে ডুবিয়ে মারবেন! শয়তান-দেবতা ও জলের রাজার হুমকিতে ভীত হয়ে জনগণ আশু বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নগাইতিকে জোর করে বন্যার জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল; তখনই শয়তান-দেবতা ও জলের রাজার ক্রোধ কমে। তারপর তিনি পাহাড়ের চারপাশ থেকে বন্যার জল কমিয়ে নেন।[৪৬]

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের মতে মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হওয়ার কাহিনীটি অনেক বেশী সহজ-সরল, যা প্রমাণ করা অসম্ভব; যেমন:

(ক): মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সব জাগায় গড়ে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হলেও ২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক জল জমতে পারে না। প্রতি বর্গমিটারের উপরে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে, এতে গড়পড়তা ১৮ কিলোগ্রাম জলীয়বাস্প থাকা সম্ভব, তবে ২৫ কিলোগ্রামের অধিক থাকা অসম্ভব। বায়ুমণ্ডলের এই আদ্রতা ঘনীভূত হয়ে একসঙ্গে যদি ঝরে পড়ে, তাহলে পৃথিবীতে জলস্তরের গভীরতার পরিমাপ হবে ২.৫ সেন্টিমিটার; কারণ এক বর্গমিটার জায়গায় সবচেয়ে বেশী জল থাকতে পারে ২৫ কিলোগ্রাম বা ২৫,০০০ গ্রাম; এবং ২৫,০০০ গ্রাম জলের আয়তন হবে ২৫,০০০ ঘনসেন্টিমিটারের সমান। এই আয়তন হবে প্রতি ১ বর্গমিটার বা ১০০ × ১০০ = ১০,০০০ বর্গসেন্টিমিটার জায়গার উপরের স্তরে। জলের আয়তনকে ভূমির ক্ষেত্রফল দিয়ে ভাগ করলেই জলস্তরের গভীরতার পরিমাপ করা যায়, ২৫,০০০ / ১০,০০০ = ২.৫ সেন্টিমিটার; অর্থাৎ মহাপ্লাবনে সবচেয়ে বেশী জল জমা হলে, তা হতে পারে

[41] Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.
[42] Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.
[43] Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.
[44] Note: Khun litang and Chu liyang.
[45] Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.
[46] Myth, Legend, and Custom in the Old Testament, Theodor H Gaster, Harper & Row, New York, 1969.

২.৫ সেন্টিমিটার গভীর বা পৃথিবীর সবজায়গায় গড়ে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হলেও মাত্র ২.৫ সেন্টিমিটার জমতে পারে। তাহলে দেখা যাচ্ছে, হযরত নুহের সেই কথিত মহাপ্লাবনে সত্যিই ২.৫ সেন্টিমিটার থেকে অধিক জল জমা সম্ভব নয়; তবে বহু জায়গায় বৃষ্টিপাত অনেক সময় ২.৫ সেন্টিমিটারকে ছাড়িয়ে যায়; কারণ সেসব ক্ষেত্রে জল বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি শুধু সেই অঞ্চলেই পড়ে না, বাতাস আশপাশের অন্যস্থান থেকেও বয়ে আনে; কিন্তু 'তৌরাৎ'-এর মতে, মহাপ্লাবন একইসঙ্গে সমস্ত পৃথিবীকে ডুবিয়ে দিয়েছিল জলের নীচে;[৪৭] সুতরাং তখন এক-অঞ্চল থেকে অন্য-অঞ্চলে বাতাসের মাধ্যমে জল আসা সম্ভব ছিল না। হিশেব করে দেখা যায় যে, সারা পৃথিবী জুড়ে প্লাবন যদি হয়েও থাকে, তাহলেও জল ২.৫ সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারে না। এছাড়া 'তৌরাৎ'সহ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী, মহাপ্লাবনের ফলে পৃথিবীর সমস্ত পাহাড়-পর্বত ডুবে গিয়েছিল। এ্যভারেস্টের মত একটি পর্বত জলে নিমজ্জিত হতে হলে উচ্চতায় কমপক্ষে ৯ কিলোমিটার জলের প্রয়োজন; কারণ, হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮.৮ কিলোমিটার বা ৮,৮০০ মিটার উঁচু। ৮.৮ কি.মি. বা ৮৮০,০০০ সে.মি. সংখ্যাটিকে ২.৫ সে.মি. (জলস্তরের গভীরতা) দিয়ে ভাগ করলে পাওয়া যায় ৩৫২,০০০ (তিন লক্ষ বাহান্ন হাজার)। এতএব, বিজ্ঞানের মতে, গণিত দ্বারা মহাপ্লাবন অনুষ্ঠিত হওয়ার কাহিনীটি প্রমাণ করা অসম্ভব।

(খ): 'তৌরাৎ'-এর মতে, নুহ্ (আ.) এর জাহাজে পৃথিবীর সমস্ত (পাখি, মাছ, সরীসৃপ, উভয়চর ও স্তন্যপায়ী) প্রাণীদের জোড়ায়-জোড়ায় ও তাদের বেঁচে থাকার উপযোগী পর্যাপ্ত পরিমাণের খাবার রাখার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল;[৪৮] তবে যেরকম জায়গার প্রয়োজন ছিল তা ৩০০ × ৫০ × ৩০ = ৪৫,০০০০ কিউবিক হাত জায়গায় ধারণ করা অসম্ভব; কারণ, প্রাচীন পশ্চিম-এশিয়ার লোকদের একহাত বলতে যে মাপ বোঝানো হত, তাকে দশমিক পদ্ধতিতে পরিবর্তন করলে, অনুমানিক জাহাজটির আয়াতন হবে: লম্বায় ১৩৭ মিটার, চওড়ায় ২৩ মিটার, এবং উচ্চতায় ১৪ মিটার; তাহলে জাহাজের ঘনমান মাপ হবে ১৩৭ (লম্বা) × ২৩ (চওড়া) × ১৪ (উচ্চতা) = ৪৪১১৪ কিউবিকমিটার।

পৃথিবীতে প্রায় ৩৬ রকম প্রাণীবর্গ[৪৯] আছে; যথা– (1) Acanthocephala; (2) Acoelomorpha; (3) Annelida; (4) Arthropoda; (5) Brachiopoda; (6) Bryozoa; (7) Chaetognatha; (8) Chordata; (9) Cnidaria; (10) Ctenophora; (11) Cycliophora; (12) Echinodermata; (13) Echiura; (14) Entoprocta; (15) Gastrotricha; (16) Gnathostomulida; (17) Hemichordata; (18) Kinorhyncha; (19) Loricifera; (20) Micrognathozoa; (21) Mollusca; (22) Nematoda; (23) Nematomorpha; (24) Nemertea; (25) Onychophora; (26) Orthonectida; (27) Phoronida; (28) Placozoa; (29) Platyhelminthes; (30) Porifera; (31) Priapulida; (32) Rhombozoa; (33) Rotifera; (34) Sipuncula; (35) Tardigrada; (36) Xenoturbellida. এই প্রাণীবর্গে প্রায় ২০ লক্ষ জাতের প্রাণী আছে (অনাবিষ্কৃত রয়েছে ১৪ লক্ষ)। আর উদ্ভিদবর্গটি হচ্ছে: (1) Anthocerotophyta; (2) Bryophyta; (3) Marchantiophyta; (4) Lycopodiophyta; (5) Pteridophyta; (6) Pteridospermatophyta; (7) Pinophyta; (8) Cycadophyta; (9) Ginkgophyta; (10) Gnetophyta; (11) Anthophyta (or Magnoliophyta). অন্যদের হিশেব না-করে; উদাহরণ স্বরূপ মেরুদণ্ডী প্রাণী (Phylum Chordata) প্রাণীবর্গটিকেই নেওয়া যাক। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: (১) মাছ (fishes); (২) উভচর (amphibians); (৩) সরীসৃপ (reptiles); (৪) পাখি (birds); (৫) স্তন্যপায়ী (mammals)। মেরুদণ্ডী প্রাণীবর্গের স্তন্যপায়ী প্রাণীই পৃথিবীতে আছে প্রায় ৫,৮০০ জাতের।

[৪৭] আদিপুস্তক : ৭:২০।
[৪৮] আদিপুস্তক : ৬:১৫।
[49] Note: Animal phyla.

জাহাজে প্রতিটি 'আবিষ্কৃত' প্রজাতি প্রাণীর জন্য জায়গা বরাদ করা সম্ভব হবে, ৪৪১১৪ (জাহাজের ঘনমান) / ২০ লক্ষ (প্রাণীবর্গের মোট সংখ্যা) = ০.০২ কিউবিকমিটার। স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে রাইনো, হিপ্পো, বাঘ, সিংহ, হাতি, জিরাফসহ বিশাল আকারের জন্তু রয়েছে। এতএব, বিজ্ঞানের মতে, এই অল্প জায়গায় দুটি করে এসব বিশাল আকারের স্তন্যপায়ী প্রাণীর বাস করা অসম্ভব।

(গ): 'তৌরাৎ' অনুযায়ী, পৃথিবী ১৫০ দিন জলের নীচে ডুবে ছিল।[৫০] তাহলে সেই সময় স্তন্যপায়ীদের জন্যই কেবল জায়গার ব্যবস্থা করতে হয়নি, তাদের খাবারের জন্যও করতে হয়েছিল; সঙ্গে-সঙ্গে নুহ্ (আ.), তাঁর স্ত্রী, তাঁদের সন্তান, সন্তানের স্ত্রীদের জন্য বসবাস করার জায়গাসহ তাঁদের খাবার-দাবার রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে এই জায়গা পর্যাপ্ত ছিল না। তৃণভোজ প্রাণীদের জন্য ঘাস-গাছ-গাছালি, মাংসাশি প্রাণীদের জন্য মাংসসহ খাদ্যসামগ্রী রাখার ব্যবস্থা করা কী সম্ভব হয়েছিল? ছোট্ট একটি উদাহরণ হিশেবে বলা যায়, কোয়ালা নামক লেজবিহীন ছোট ভালুকের মত প্রাণিটি রোজ এক কেজি করে ইউক্যালিপটাস (Eucalyptus) গাছের পাতা খায়, যা তার পুষ্টি ও জলের চাহিদা মিটিয়ে দেয়। সেই জাহাজে ত শুধু স্তন্যপায়ী প্রাণীদেরই জন্য পর্যাপ্ত জায়গা ছিল না, আবার অন্যান্য প্রাণীসহ ১৫০ দিন চলার মত তাদের খাদ্য মজুদ রাখার ব্যবস্থাসহ জায়গা হয়েছিল কী?

উপসংহার

সারসংক্ষিপ্ত করলে প্রায় একই ধরনের কাহিনীর অস্তিত্ব পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে, বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকগাঁথা, বিভিন্ন পৌরাণিক উপাখ্যানে পাওয়া যায়। লোকগাঁথা বা পৌরাণিক উপাখ্যানের বর্ণনাকে সাধারণ মানুষ অবাস্তব কাহিনী বা শুধু গল্প হিশেবে মেনে নিলেও, ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত বর্ণনাকে 'সত্য' হিশেবেই বিশ্বাস করেন ধর্মে বিশ্বাসী বেশীরভাগ মানুষ; আজন্ম লালিত তাদের পবিত্র 'বিশ্বাস'-এর কারণে 'কাহিনী' বলে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন না। তবে একথা সত্য যে, এই মহাপ্লাবনের কাহিনী দীর্ঘদিন আপামর সাধারণ মানুষের মনে 'সৃষ্টির প্রতি ঈশ্বরের লীলা বা প্রতিশোধ' হিশেবে ধারণা দিয়ে আসছে, তবে দু-একটি আদি লোকগাঁথা শয়তান দেবতার কর্মকাণ্ড হিশেবেই এর উল্লেখ করেছে, ফলে নানাসময়ে প্রখ্যাত এই লোকগাঁথাগুলো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার (যেমন বিবর্তনবাদ) প্রমাণের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিবর্তনবাদের প্রবক্তা খোদ চার্লস ডারউইন থেকে শুরু করে ভূতত্ত্ববিদ চার্লস লায়েল, চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দা ভিঞ্চিসহ আরও অনেকেই এই মহাপ্লাবনের বিপক্ষে নানা প্রমাণ হাজির করে মানুষের বিভ্রান্তি দূর করতে চেষ্টা করেছেন। তারপরও মানুষের পক্ষে 'পবিত্র' বিশ্বাসের মিশেল দেওয়া 'অর্ধসত্য আর অর্ধমিথ্যার কৃষ্ণগহ্বর' থেকে বেরিয়ে এসে 'পূর্ণসত্যে'র সন্ধান করা সহজ হয়নি।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য ইহুদি ধর্মগ্রন্থ 'তৌরাৎ'কে বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ, 'তৌরাৎ'-এর 'জেনেসিস অধ্যায়'-এ নুহ্ (আ.)-এর জীবনী, জাহাজের বর্ণনা, মহাপ্লাবন ইত্যাদি বিষয় যেরকম বর্ণনা রয়েছে, অন্যকোনও ধর্মগ্রন্থ বা পৌরাণিক লোকগাঁথাতে এরকম নেই, বা যা আছে তা খুবই ভাসা-ভাসা অথবা হালকা-হালকা; ফলে 'আদিপুস্তক' ব্যতিরেকে বাকি সকল ধর্মগ্রন্থের বাণী বা লোকগাঁথা থেকে 'তথ্য' নিয়ে মহাপ্লাবনের কাহিনীটিকে 'সত্য' প্রমাণ করা সম্ভব নয়; বা এই তথ্য সম্পর্কে সংশয়ী হয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান চালানোও সম্ভব নয়।

ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত মহাপ্লাবনের বর্ণনাকে স্বীকার করে না বিজ্ঞান, অঙ্কের সাহায্যেই তাকে খণ্ডানো হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এও মনে করেন যে, যদি এরকম কিছু ঘটে থাকে তাহলে অবশ্যই এ-ছিল একটি স্থানীয় বন্যা বা প্লাবন, কারণ প্রাচীনকালের সকল সভ্যতাই নদীর তীর ঘেষে গড়ে ওঠে, উদাহরণ হিশেবে বলা হয়– নীলনদের তীরে মিশরীয় সভ্যতা, সিন্ধুনদের তীরে সিন্ধু সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীরে ব্যবিলনীয় সভ্যতা এবং গঙ্গা নদীর তীরে বঙ্গীয় সভ্যতা। নদীকেন্দ্রিক সভ্যতা তৈরি হলে, সহজেই ধারণা করা যায়, স্থানীয়ভাবে বন্যা হওয়া খুবই স্বাভাবিক; এবং সেই বন্যার সময় ঘটে-যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা প্রাচীনকালের মানুষকে বেশ আকর্ষণ করেছিল; এই

[৫০] আদিপুস্তক : ৭:২৪।

আকর্ষণের প্রভাবই গিয়ে পড়ে সেই অঞ্চলের মানুষের চিন্তাচেতনায়; সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়ে পৌরাণিক গল্পে, আঞ্চলিক লোকগাঁথায়। তাই হয়ত আরজ আলী মাতুব্বর বলেছেন, 'বর্তমান বিজ্ঞানের যুগে লোহা-লক্কড়, কলকব্জা ও ইঞ্জিন-মেশিনের অভাব নাই। তথাপি ঐ মাপের একখানা জাহাজ মাত্র সাত দিনে কোন ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করিতে পারেন না। হজরত নূহ উহা পারিলেন কিরূপে? নদ-নদী ও সাগরবিরল মরুদেশে সূত্রধর ও কাঠের অভাব ছিল না কি? বিশেষত কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র ছিল কি? অধিকন্তু ইহারই মধ্যে পৃথিবীর যাবতীয় পশু-পক্ষী ও কীট-পতঙ্গাদি জোড়া জোড়া এবং যাবতীয় গাছ-পালার বীজ সংগ্রহ করিয়া জাহাজে বোঝাই করিলেন কোন সময়?/ উক্ত প্লাবনে নাকি পৃথিবীর সকল প্রাণীই বিনষ্ট হইয়াছিল, মাত্র জাহাজে আশ্রিত কয়েকটিই জীবিত ছিল। বর্তমান জগতের প্রাণীই নাকি ঐ জাহাজে আশ্রিত প্রাণীর বংশধর। তাহাই যদি হয়, তবে মানুষ ও পশু-পাখী সেখান হইতে আসিতে পারিলেও, কেঁচো ও শামুকগুলি বাংলাদেশে আসিল কিভাবে?'[৫১]

[৫১] আরজ আলী মাতুব্বর; রচনা সমগ্র ১; ১৯৯৩।